বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন: বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

প্রকাশ: ০৫ মার্চ, ২০২১; লাইব্রেরিয়ান ভয়েচ (http://www.librarianvoice.org)

সার-সংক্ষেপ

আমাদের জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের অতীত ও ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপন করি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত নির্মাণ করি। গ্রন্থ রচয়িতা তাঁর অভিজ্ঞতা গ্রন্থে বিবৃত করেন। গ্রন্থ পাঠে আমরা জ্ঞান সাধকদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের জীবনের পরিধিতে আঙ্কার করি এবং উপকৃত হই। একটি গ্রন্থাগার, যেখানে বৈচিত্র্যময় গ্রন্থের সংগ্রহ থাকে, সেখানে পৃথিবীর সর্বকালের সবপ্রকার অভিজ্ঞতা, বিদ্যা, জ্ঞান এবং আবিষ্কারের সারাংশ সংরক্ষিত থাকে। একটি গ্রন্থাগারের অতল সমুদ্রে ডুবে থাকে জাতীয় জীবনের বহুবিধ শাখার দিকনির্ণয়ের সমস্ত উপকরণ। মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র তার বর্তমান মুহূর্তকে ঘিরে নয়, তার পরিচয় তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে। অতীতকে জানতে হলে মানব সৃষ্টির ইতহাসের আদিকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিপুল ধারাস্রোত প্রবাহিত, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অর্জন করতে হবে এবং তাতে করেই যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো। সংগত মানুষ হিসেবে আমাদের পৃথিবীকে জাগ্রত করতে পারব। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অতীতকে জাজ্বল্যমান করা সম্ভব। বর্তমান মুহূর্তে বর্তমান যেমন অতীতের কোন এক চিন্তার ভবিষ্যৎ, তেমনি ভবিষ্যতের কোনো এক মুহূর্তে বর্তমান চিন্তা ভবিষ্যতের বিষয়বস্তু হবে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্রমধারা স্রোতের রেখা নির্ণয়ের মাধ্যমে যাতে ভবিষ্যতকে এক উজ্জ্বলতর সম্ভাবনায় আকীর্ণ করা যায়, সেজন্য এই প্রবন্ধের প্রচেষ্টাকে জাগ্রত প্রয়াস রূপে রূপায়ণের প্রচেষ্টা। নির্ণীত রেখায়ন উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাঁদের প্রচেষ্টার আঁচড় ছুঁইয়েছিল দূর অতীত থেকে বর্তমান অবধি তাঁদের অন্যতম আমাদের

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে বই ছিলো একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে অবস্থিত পারিবারিক গ্রন্থাগারটি বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনন্য সম্পদ। তাঁর ১৩১৩ দিনের নিরলস প্রয়াসের ধারাপাত বক্ষমান প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমিকা:

বৈজ্ঞানিক মতে বর্তমান উন্নতির মানবজাতির ক্রমবিকাশের বয়স প্রায় ১০,০০০ বছরের। কিন্তু গ্রন্থাগারের কুষ্ঠি বিচারে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রথম ৪০০০ থেকে ৫০০০ বছর খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয় মিশরের সুমেরিয় অঞ্চলে ও এশিয়া মাইনারে। সম্রাট অ্যাশুরবনিপাল কর্তৃক ৬২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় মিশরের নিনেভেতে। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার। সে হিসেবে বিশ্বে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার বয়স আড়াই হাজার বছরের। গ্রন্থাগারর সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত বিষয় জড়িত। সভ্যতার বিকাশই হয়তো ঘটতো না যদি না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গ্রন্থাগার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতো। স্বীকার করতেই হবে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত ও যুগযুগান্তরে বিকশিত করেছে গ্রন্থাগার। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য এই উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য। প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারের বিকাশ নেহায়েৎ অকিঞ্চিতকর নয়। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকালের। গোড়া থেকেই অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে ও শিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিভিন্ন ধরণ ও আকারের পুঁথি কিংবা গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ১ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সূচনা প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ময়নামতি ও মহাস্থানগড়সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বিহারের

সেসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপকরণ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন দূর দেশের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষের পদব্রজে আসা-যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ২ এছাড়াও হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উক্ত বিবরণ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিকাশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পর্বকে মোট ৫ ভাগে বিভক্ত করে অনুসন্ধানের ধারা বর্ণনার প্রয়াস করা হলো:

১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব
২. বৃটিশ শাসনকালীন পর্ব
৩. স্বাধীনতা পূর্ব (১৯৪৭-১৯৭১) পর্ব
৪. স্বাধীনতাত্তোর '৭৫ পূর্ব পর্ব (১৩১৩ দিন) ও
৫. পচাত্তোর থেকে বর্তমান পর্যন্ত পর্ব।

১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব

বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের মহাসড়কে এই উপমহাদেশের সরব জাগরণ মানব সভ্যতা ও জীবন চর্চার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বলতম বিস্ময় হলো মানুষের স্মৃতির সঞ্চয়। মানুষের মৃত্যুর পর 'মানসিক স্মৃতি মানবদেহের সঙ্গেই বিগত হয়। ' সুতরাং সভ্যতার কাল পরিক্রমায় পরিবর্তিত যুগ-যুগান্তরের মানুষের স্মৃতিকে, অভিজ্ঞতাকে, চিন্তা-ভাবনাকে, চেতনা, অনুচিন্তন ও অনুভবের উৎসারিত ফসলকে, সৃষ্টিশীল অনুগামী রচনাগুলোকে, উপলব্ধির উপলক্ষগুলোকে উত্তরসূরীদের জন্য, অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও মানব সমাজের জন্য গ্রোথিত করে রেখেছিলো গ্রন্থাগার সৃষ্টির মাধ্যমে। কালোত্তীর্ণ ধারাবাহিকতায় সেগুলোই মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশকে উত্তরসূরীদের জন্য সংরক্ষণ করার মানসে ব্যবহৃত হয়। মধ্য এশিয়ার পোড়া

মাটির ওপর লেখা মৃন্ময় চাকতি (Claz Tablet) কিংবা মিশরের প্যাপিরাসের পাটি মানব সভ্যতার ঊষাকালের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। তখনো সংগ্রহ করা হতো, প্রয়োজনে সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয় অনুযায়ী বিন্যাস ব্যবস্থা অবলম্বনের নিদের্শনাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সহায়ক আদি বিদ্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রাচীনতম অধিবিদ্যার একটি অন্যতম বিদ্যা হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। মানব দর্শনের ষুষ্ঠু বাস্তবায়নের সঠিক দিক নিদের্শনা জ্ঞাপনে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। একথা বলা অনস্বীকার্য যে, যখন থেকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, তখন থেকেই সেগুলোকে সংগঠিত করা হয়। ইতিহাস পরিক্রমায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিন্যাস ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারের অগ্রগতি সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

সুতরাং এমন একটা সময় আসে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানের বিস্তার লাভের পাশাপাশি গ্রন্থাগার সংগঠনের কৌশল অনুশীলন মানব সভ্যতারই বিকাশমান স্রোত ধারার একটি অন্যতম ধারা। এরই ধারাবাহিকতায় একটি গ্রন্থাগার সুন্দরভাবে গড়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছে; তা না হলে জঞ্জাল হিসেবে তাবৎ সভ্যতাই পরিত্যক্ত হতো। একটি গ্রন্থাগার যখন সংগঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার সংগ্রহ থাকে অল্প, চাহিদা থাকে সীমিত, কাজের পরিধিও থাকে কম। দিন যায়, প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সুবাদে প্রয়োজন ও সেবার চাহিদা বহুমাত্রিকতায় উন্নতি লাভের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহও বৃদ্ধি পেতে খাকে। রঙ্গনাথনের পঞ্চম নীতি অনুযায়ী সংগ্রহ একদিন মহীরূহে রূপ লাভ করে। তাই এর সংগ্রহ থেকে পাঠককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চলে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রসার মূলত এদেশে জ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশকে চলমান রেখেছে। এই সুবাদে দাবী করা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সূচনা হয় প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বিকাশমান ধারাটি সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

২. বৃটিশ শাসনকালীন পর্ব

পৃথিবী ও সভ্যতার বিবর্তন হয়েছে; যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান বিগ্রহের জন্য মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বহুবার। আবার নবজাগরেণের মাধ্যমে সভ্যতার ব্যাপক স্ফুরণ ঘটেছে যেমনি, একইভাবে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে দেশ ও জাতির শিক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ব্যাহত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন, আগ্রাসন, চাপিয়ে দেওয়া অপকৌশল উন্নয়নের উপাদানগুলোকে অবদমিত করেছে। প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শাসন আমলে এ উপমহাদেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রগতির চেয়ে শোষণই প্রাধান্য পেয়েছে অধিকতর। উল্লেখ্য যে, উন্নয়নের ছোঁয়ায় মানুষ অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কায় বৃটিশদের অনীহা প্রবল ছিলো। বিশেষত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকরণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। যেটুকু উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করা যায় তা কেবল বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসেই।

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিঞ্চিত সূচনা হয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক স্থানেই বিভিন্ন শ্রেণির গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে

দেখা যায়। সে সময়ে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় কিছু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ঊনিশ মতকের প্রথম দশকেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শহর কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ত্রিশের দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং'র ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং লর্ড অকল্যান্ডের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্যবর্তীকালে (মার্চ ১৮৩৫- ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ এক বছরের জন্য অস্থায় বড় লাট নিযুক্ত হোন। এ সময়েই একটি বড় কীর্তি সংগঠিত হয়; ১৮২৩ বঙ্গেরর ১৮২৫ সালে তৎকালীন বোম্বাইয়ের এবং ১৮২৭ সালে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরক আইনগুলো রদ করে সমগ্র ভারতেই মুদ্রণযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ৩ ১৮৩৫ সালে ৩ আগস্ট এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর কার্যে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় দেশী ও বিদেশী অধিবাসীবৃন্দ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বহু সভা-সমিতির আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালের ২০শে আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্থায় নিদর্শন স্বরূপ ''মেটকাফে লাইব্রেরী বিল্ডিং'' নামে একটি ভবন নির্মিত হবে এবং এখানে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। ৪ এটাই মূলত পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে। গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হলেও প্রকাশ্যভাবে এরেউন্মোচিত হয় ১৮৩৬ সালের ৮ই মার্চ। এটাই ছিলো অবিভক্ত বাংলার সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রথম গণগ্রন্থাগার। ৫

বৃটেনে ১৮৫০ সালে প্রথ গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঠিক এর এক বছর পর ১৮৫১ সালে যশোরে বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়া ফলে গণশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেই আদলে ভারবর্ষেও তৎকালীন জমিদার, উমেদার, সমাজসেবী সরকারি কর্মকর্তা ও জনহৈতষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে

গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে একযোগে আরো তিন জেলা সদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরি, যার সংগ্রহে ছিল ২৫০০০টি গ্রন্থ, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি এবং দু'টি লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯,৮০০ এবং ১৭, ২০০টি গ্রন্থ। ১৮৫৪ সালটিকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ সালে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিল্লা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে রিয়ে চলে। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি। ৬

গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পূর্ব বঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বেশ কিছু কলেজ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো ইতোপূর্বেই ঐতিহ্যের শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা কলেজ (১৮৪১), জগন্নাথ কলেজ (১৮৪৪), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), এম.সি. কলেজ (১৮৯২), পাবনা এওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) অন্যতম।

এরই মধ্যে ১৮৬৭ সালে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা হয়। এরপরে পর্যায়ক্রমে ১৮৭২-৭৬ সালের কোন এক সময় বুড়িগঙ্গার তীর ঘেষে ঢাকার বাংলাবাজারে ভারতবর্ষের গভর্ণর নর্থব্রুক হল লোইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারটি ঢাকা শহরের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠে। ১৮৮২ সালে বরিশালের বানারী পাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনায় ১৮৯০ সালে আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি এবং ১৮৯৭ সালে খুলনায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আরো বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৭), নীলফামারী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১), এবং ভোলায় ওয়েস্টার্ণ ডায়মন্ড জুবেলি সগ্রন্থাগার ও ক্লাব (১৮৯৮) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশেষত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাটি একটু গতিশীল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০১), বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বাকল্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৪), উল্লেখ্য চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে (১৯৬৩)। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি, ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ঢাকার পাটুয়াটুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৫), গাইবন্ধা পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৭), ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারের অন্যতম লেখক ও মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট বি.সি. এলেন মুন্সীগঞ্জে হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৮), নওগায় প্যারীমোহন সমবায় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১০), লালমনিরহাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১১), রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম রিসার্চ লাইব্রেরি (১৯১০), রাণীনগরপুর ও গুরুদাসপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১৫), প্রতিষ্ঠিত। ১৯১২ সালে কুমিল্লার তৎকালীন সমাজসেবী শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের নামে 'রাম মালা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা যাদুঘর লাইব্রেরি।

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বরোদার মহারাজা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। স্যার তৃতীয় সায়াজীরাও ১৯১০ সালে মৌলিকভাবে গ্রন্থাগার পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম প্রধান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে বরোদার W.C. Borden'র তত্ত্বধানে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯১৫ ও ১৯১২৯

সালে যথাক্রমে পঞ্জাব ও মাদ্রাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয় এবং আমেরিকান গ্রন্থাগারিক Asa Don Dickenson'র তত্ত্বধানে লাহোরে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ওখান থেকে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক বলে খ্যাত কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির মরহুম গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ খানসহ বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবন্বিত হয়ে তৎকালীন ভারত সরকার নিখিল ভারত গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ১৯১৮ সালে। তা ৪-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতৃস্থানীয় গণগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি চালু করে ছোট-বড় সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ৭ এটা একটি সাংবিধানিক কাযর্ক্রম ছিল। তারপরেই ১৮৮৫ সালের স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯ সংশোধিত হলো এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভার উপর অর্পিত হলো গ্রন্থাগরের দায়িত্ব। ৮

১৯২১ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন কার্যত বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই দশকের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে ইতস্তত গ্রন্থাগার সৃষ্ঠির উদ্যম অকিঞ্চিৎকর ছিলো না। কিন্তু তখন গ্রন্থাগার আন্দোলন বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত ছিলোনা। এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাপ্ত ছিলো। সমগ্র বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯

মোটামুটিভাবে আন্দোলনের প্রভাবে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের প্রসার হতে থাকে। এ দশকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি অধ্যাদেশ প্রচার করে বৃটিশ সরকার। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় এবং সে সাথে গ্রন্থাগার সার্ভিসেরও প্রবর্তন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই মূলত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বীকৃতি স্বরূপ। ১০ আলোচ্য দশকের মধ্যভাগে ১৯২৪ সালে কতিপয় দেশকর্মীর উদ্যোগে এবং উৎসাহে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে জনসাধারণের জন্য কয়েক স্থানে শাখাসহ বিনা চাঁদার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সার্ভিস চালু হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য কয়েকটি জেলাতেও এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়াস হয়েছিল বলে জানা যায়। ১১ পুনরায় ১৯২৫ সালের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি গ্রামে রাজবাড়ি মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একটি মহকুমা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। . . . সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে) অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্বে জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক কিছু কিছু সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে। ১২

ভারতবর্ষ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলা সদরে একটি করে পাবিলিক লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। এখনো সেগুলো কোন না কোনভাবে সরকারি কিংবা বেসরকারি লাইব্রেরি হিসেবে চলমান আছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিধারা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ধাবমান ছিল । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গতিধারায় কতক শিথিলতা নেমে আসে। অন্যদিকে তারই অব্যরহিত কিছুদিন পরে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের উদ্ভব হয়। এর ফলে উজ্জীবিত চাঞ্চল্যেও স্থবিরতা দেখা যায়। আন্দোলন বেশ পছিয়ে পড়ে । ১৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে তৎকালীন সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার ফলে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার লাভ করার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ

করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৪১ সালের মধ্যে বরিশাল ও পটুয়খালী অঞ্চলে ৬১টি, বগুড়ায় ৩২টি, ঢাকা জেলায় ২৫টি, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৯, ফরিদপুরে ২৩টি, রাজশাহীতে ৪৮টি, রংপুরে ২৬টি, ৫১টি, নোয়াখালী ও সিলেটে যথাক্রমে ১৫ ও ২১টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার খোঁজ পাওয়া যায়। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ও বেসরকারি আরো ১২১ টি গ্রন্থাগারের হিসেব পাওয়া যায় বিভিন্ন উৎস থেকে। বর্তমানে এগুলোর অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৩৫টিরও বেশি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার, উমেদার, সমাজ হিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা পরিবার এই গ্রন্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিলেন।

৩. স্বাধীনতা পূর্ব (১৯৪৭-১৯৭১) পর্ব

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। গ্রন্থাগার উন্নয়ন ঝিমিয়ে পড়ার রেশ তখনো কাটেনি। কার্যত তখন পাঞ্জাব, লাহোর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই সজীব ছিল বলা যায়। কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রথম দশ বছর প্রায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ১৪ পাকিস্তান এ সময়ে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দিতে পারেনি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি ভাগাভাগির ন্যায় বৃটিশ আমলের ভারতীয় লাইব্রেরিসমূহের ভাগ না পাওয়ায় বেশ ক্ষতিই হয়। কলকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি), ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও দিল্লী এবং অন্যান্য শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারি গ্রন্থাগারের পাওনা কোনো অংশই পাকিস্তান লাভ করেনি। ১৫ কিন্তু অন্যদিকে লাহোরে অবস্থিত সরকারি মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারগুলো থেকে ভার যথার্থ অংশ আদায় করেছিল। ১৬ গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের দৈন্যের সূচনা তখন থেকেই। এছাড়া দেশ বিভাগের পরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক

অস্থিরতা নিয়ে পাকিস্থানকে রীতিমতো হিমশিম খেতে দেখা যায়। বিশেষ করে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতা পাকিস্তানের শাষক গোষ্ঠীকে এতটাই নাজেহাল করে যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার ফুরসতই ছিল না। আরো লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ সময়, শ্রম ও অর্থের যোগান দেওয়া হয়নি। তারওপর পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ইচ্ছাকৃত অবহেলা আর বৈষম্যমূলক শোষণতো ছিলই। উল্লেখ্য যে, এতোসব টানাপোড়েনের মধ্যে ১৯৪৯ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার 'ডাইরেক্টোরেট অব আর্কাইভস এন্ড লাইব্রেরিজ' প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। একই সময়ে পাকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও সার্বিক গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। প্রকৃত অর্থে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতেও পাকিস্তানী শাসকদের তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এ সময়ে বিশেষ কজরে মুসলিম লীগ ভেঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদ জানান। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২ মার্চ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো সংগঠিত করার লক্ষ্যে ফজলুল হক মুসলিম হলে বিভিন্ন দলের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। সমগ্র দেশ তখন রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে উত্তাল। এ সময় ১১ মার্চে পালিত ধর্মঘট পালনকালে আরো কিছু সহযোদ্ধাদের সাথে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে অন্তরীণ করা হয়; তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় থাকে (প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস)। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি মাসে খাজা নাজিমউদ্দিন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু' ঘোষণা করার প্রতিবাদে শেখ মুজিব বন্দী থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দী মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী দিবস

হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এ দাবীতে জেলখানায় অনশন করেন টানা ১৩ দিন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করারদাবীতে সোচ্চার ছাত্রসমাজ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এদিন সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, শফিউরসহ আরো অনেকের রক্তের বিনিময়ে বাংলা পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জীবনাচার, সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র একই সূতোয় গাঁথা, স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন নিজের ভাষা। এই ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। বাংলা ভাষার দাবীকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারার কারণেই বাঙ্গালীর স্বকীয়তার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। বাঙ্গালী নিজের মাতৃভাষায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

আন্দেলনের মুখে ২৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেলেও তাঁকে হয়রানি করা থেকে পাকিস্তানীরা বিরত থাকেনি। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার মর্যাদাকে অক্ষণ্ন রাখা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়ে যাওয়ার কারণেই হয়তো গ্রন্থাগার উন্নয়নের যুৎসই কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাষার সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা শিল্প ওতোপ্রোতভাবে শুধু জড়িতই নয় একটি অপরটির পরিপূরক। আর প্রকাশনার উপরই গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট। এ সময় এ কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশি করে সোচ্চার হতে দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভাষার উপর ভিত্তি করেই জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ভাষার স্বাধীনতা ছাড়া দেশ ও জাতির স্বাধীণতা অর্থহীন। শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস সাহিত্য সৃষ্টির ধারক ও বাহক হচ্ছে গ্রন্থাগার। এই উপলব্ধি আর কারোর মাঝে উঁকি না মারলেও শেখ

মুজিবুর রহমান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জেলখানায় বসে একটি গ্রন্থাগার কী অপরিসীম শক্তি ধারণ করে রাখে। আমরা দেখেছি তাঁর জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কী রূপ যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

অব্যাহত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলে তদানীন্তন পাকিস্তানের শিক্ষা পরিচালকের এক আদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৫৩ সালে চারটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপনের এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ ও ১৯৬২-৬৩ শিক্ষবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। [১৭] ১৯৫৩ সালে ঢাকায় প্রথম কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে একটি মাইল ফলক উন্মোচন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৫৪ সালের পর ১৯৫৪ সালে একশত বছর পর এ দেশের অবিসংবাদিত নেতাই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গে সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে এক গৌরবোজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছিলেন। সম্ভবত ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু গ্রন্থাগারটির পাঠক সেবার দ্বার উন্মোচন করা হয় ১৯৫৮ সালে এবং জনাব আহমাদ হোসাইন প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এম.এস ডিগ্রী অর্জন করেন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে গ্রন্থাগার ভবনটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৫৫-৫৯ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বর্তমানে শাহবাগে গ্রন্থাগারের জন স্থান নির্ধারণ করা হয়। অবশেষে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয় ভবন ছেড়ে দিয়ে শাহবাগস্থ বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। [১৮] অর্থাৎ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শিক্ষা উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আহসান ৬ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে শাহবাগস্থ বর্তমান কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক

খান (এম.এস.খান) যুক্তরাজ্য গমণ করেন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য এবং ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারি গ্রন্থাগারিক l.C. Key কে দেশের গ্রন্থাগার সেবা জরিপের কাজে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৬ সালে জরিপের কাজ সম্পন্ন হলেও পরবর্তী সময়ে রিপোর্টের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বরেণ্য গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহী'র প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৩ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ফুলব্রাইট বৃত্তি কর্মসূচীতে Miss Millered L. Methvan উক্ত সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। এটি ছিল ৬ মাসের একটি সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রম। ১৯

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে জেলা ও মহকুমা পর্যায়েবেশ কিছু গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু মিউনিসিপাল লাইব্রেরি হিসে চিহ্নিত; সিলেটের হবিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, সিলেট মিউনিসিপাল লাইব্রেরি, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মিউনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরি, নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপাল লাইব্রেরি, রংপুর মিউনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত। এই লাইব্রোরগুলো মূলত জনসাধারণের চাঁদা ও অনিয়মিত সরকারি অনুদানের সাহায্যে ব্যয়ভার বহন করা হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন পাকিস্তানের শিক্ষা পরিচালকের এক আদেশে ৪টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তারই ফলস্বরূপ ১৯৫৩ প্রথম ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নেতা শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবুর রহমানও একজন সদস্য ছিলেন। স্মতব্য যে, এই উপমহাদেশে ১৮৫৪ সালে জেলা পর্যায়ে ৩টি গণগ্রন্থাগারের ঠিক একশ বছর পর ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। যদিও এর পাঠক সেবার দ্বার উন্মোচন করা হয় ১৯৫৮ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং ১৯৬৫ সলে স্থাপিত হয় খুলনা বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার। ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছাড়া তেমন আশাব্যঞ্জক গ্রন্থাগার উন্নতি লাভ করেনি। ২০

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও নিয়োজিত করমীদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ১৯৬০-৬৫ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একই ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে পেশাজীবী ও মধ্যম পেশাজীবী গ্রন্থাগার কর্মকর্তা ও করমচারীদের টিচিং স্ফ ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করা হয়। এবং বেতন কাঠামোও পরিবর্তন করা হয়। ২১ কিন্তু কেন্দ্রীয় গণগন্থাগার স্থাপনের পরও গ্রন্থাগার উন্নয়ন তথা আন্দোলনের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরলিপ্ততাই মুখ্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ সালের পর সরকারের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সার্ভিসকে শিক্ষার অঙ্গীভূত হিসেবে গণ্য করা হয়। সে সঙ্গে যথাযথ উপায়ে বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য মূখ্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সে সময় প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ও ৩৬টি কলেজ সংস্কার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটি পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়াও, ১৯৭০-১৯৭৫ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও আলাদা একটি পরিদপ্তর গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও আর বাস্তবায়িত হয়নি।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৫৭ সালে তৎকালীন ডেপুটি কশিনারের তত্ত্বাবধানে ঢাকার কমিশনার অফিসে এবং ১৮৬৫ সালে রাজশাহীর কালেক্টোরেটে একটি বড় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়। ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বার গ্রন্থাগার। এছাড়া আরেকটি বিশেষ গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়, রাজশাহী কমিশনারের কারযালয়ের গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে এবং একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার। এছাড়া আর কোন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও পূর্ব বঙ্গের কোথাও সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভের ঠিকানা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে সেক্রেটারিয়েট, বাংলাদেশ এ্যাসেম্বলি হাউজ, ল্যান্ড রেকর্ড ও সার্ভে গ্রন্থাগার অন্যতম। এছাড়া ১৯৫৭ সালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই.বি.এ. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে এবং বি.আই.ডি.এস ১৯৭২-৭৩ ও ৭৩-৭৪ সালে ফোর্ড ফাউন্ডশেন কর্তৃক প্রদত্ত ডোনেশন প্রাপ্ত হয়। . . . ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১২১টি বিশেষ গ্রন্থাগারের হিসেবে পাওয়া যায় । ২২

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি (পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন) নামে প্রতিষ্ঠি হয়। এরপূর্বে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকার পলাশী ব্যারাকে একটি গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম আবদুর রহমান মৃধা, এ.ই.এম শামসুল হক, রকিব হোসাইন, সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, জামিল খান, খন্দকার আবদুর রব এবং তোফাজ্জল হোসেন। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান এবং খন্ডকালীন গ্রন্থাগারিক ড. নাফিস আহমেদের

নেতৃত্বে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আহমদ হোসাইন, আবদুর রহমান মৃধা, রকিব হোসাইন, এ.এম মোতাহার আলী খান এবং নার্গিস জাফর। এ সময়েই আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমিতি তৎকালীন East Pakistan Library Association'র প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিন সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। আহমদ হোসাইন, আবদুর রহমান মৃধা ও রকিব হোসাইনকে নিয়ে গঠিত এই কমিটিকে সহায়তা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের রিডার শামসুজ্জামান আনসারী। তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি। ১৯৫৬ সালের ৩০ জুন ঢাকার ইউএসআইএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়।

১৯৫৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত সমিতির প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মোঃ সিদ্দিক খান, সম্পাদকের দায়িত্ব পান ইউএসআইএস'র প্রধান গ্রন্থাগারিক রকিব হোসাইন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক আবদুর রহমান মৃধা নির্বাচিত হয়ে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫।

১৯৬০ সালের ২৪-২৮ ডিসেম্বরে East Pakistan Library Association'র উদ্যোগে Pakistan Library Association'র সাথে যৌথভাবে ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল মোঃ আজম খান। ১৯৬৩ সালে East Pakistan Library Association দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকায়।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বৈরি আচরণ ও অবদমিত করে রাখার সুদূর প্রসারী মনোভাব ততোদিনে শুধু গ্রন্থাগার পেশাজীবীরাই অনুধাবন করেনি। দেশের তাবৎ সচেতন মানুষ তথা রাজনীতিক মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানীদের বৈষম্য থেকে উত্তরণের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন ; যাকে বাঙালীর মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ৬ দফা মধ্যেই নিহিত ছিলো বাঙালীর সাহিত্য, ইতিহাস-কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা। যার নিগূঢ় তত্ত্ব হলো বাঙলা ও বাঙালীর জাগৃতি-স্বাধীকার অর্জনের স্বাপ্নিক ভাবনা। এ অবস্থায় সংগত কারণেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আরো জটিল হতে থাকে; শেখ মুজিবুর রহমানকে দফায় দফায় বিভিন্ন কারণে-অকারণে মামলা দিয়ে ও ষড়যন্ত্র করে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষকে দমন-পীড়নের মাধ্যরেম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে। রাজনৈতিক কর্মসূচী তবু থেমে থাকেনি। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে তথাকাথত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামী করে গ্রেফতার দেখানোহয়। ১৭ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেইট থেকে গ্রেফতার করে আটকে রাখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর অজানা জায়গায়। কঠোর রনরাপত্তার মধ্যে ১৯ জুন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে।

৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের ৬ দফাসহ ১১ দফার আন্দোলন জোরদার করে আরো সোচ্চার হয়। 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'-এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো। এই আন্দোলন থেকেই রূপ নেয় ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে। ২২ ফেব্রুয়ারী জনগণের অব্যাহত চপের মুখে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল আসামীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ

মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনা সমাবেশে ১০ লাখ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে জনাব তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে ''বঙ্গবন্ধু'' উপাধীতে ভূষিত করে নেতা ভূষিত করেন। এভাবেই পাকিস্তান বিভক্তির আভাস আরো স্পষ্টতর হতে থাকে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বিভক্তির বিষয়টি পরিণতির দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে। আওয়ামীলীগ নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তন্তরে পাকিস্তানীদের একপেশে মনোভাবের কারণে ৬ দফাসহ স্বাধীকারের দাবী থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সারা দেশ ও দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস সংগ্রামের পর ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ও দুইলক্ষের অধিক মা-বোনের লাঞ্ছনার বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে সবুজে লাল সূর্যখচিত পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়। 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের জন্য কোন সম্পদ ও সম্পত্তির অংশ বাংলাদেশ লাভ করেনি। ' ২৩

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির পুনঃনামকরণ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (Bangladesh Library Association (LAB)) নির্ধারণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (IFLA) ও কমনওয়েলথ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (COMLA) স্বীকৃতি অর্জন করে সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়।

২০০৪ সালে সমিতির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনীত হয়; পরিবর্তনের প্রধান বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল পোস্টাল বেলটের পরিবর্তে সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় সংশোধন হলো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের স্থলে হবে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ। সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের সরাসরি ভোটে প্রথম সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে প্রফেসর ড. এম. আবদুসসাত্তার ও সৈয়দ আলী আকবর। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত দশম সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা করে ২১ জন নির্ধারণ করা হয়। সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও কমিটিতে থাকবেন তিনজন সহ-সভাপতি, একজন যুগ্ম মহাসচিব, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদকসহ মোট চারজন সম্পাদক এবং ১১ জন কাউন্সিলর। এর মধ্যে ৫জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর এবং ছয়টি পদ দেশের ছয়টি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রশাসনিক বিভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো একজন কাউন্সিলরের পদ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১২-২০১৪ সময় কালের নির্বাচনে ২২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। পুনরায় ২০১৪-২০১৭ সালের কার্যকরী পরিষদ নিরবাচনে আরো একজন বিভাগীয় কাউন্সিলরের পদ সংযুক্ত হয়। পরিষদ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিন বছরের জন্য এ কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হয়ে থাকে।

৪ . স্বাধীনতাত্তোর ' ৭৫ পূর্ব (১৩১৩ দিন) পর্ব

ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধুর বাঙ্গালীর মুক্তির সনদ ৬ দফাসহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার বিস্ফোরণ , ৭০'র নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠনের ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানীদের তালবাহানা, সর্বোপরি দীর্ঘ সময়ের নির্যাতনের নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে স্বাধীনতার যুদ্ধ; ৩০ লক্ষ শহীদের শহীদের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশ মুক্তি পায় দীর্ঘ সময়ের দাসত্বের বেড়াজাল থেকে। বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আজ বাংলাদেশ। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ এ ভগ্ন-ক্লিষ্ট শরীরবিশিষ্টধ্বংসপ্রাপ্ত মাত্র। পাকিস্তানী হায়েনার দল দেশটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই নজরে আসে জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হওয়া ভগ্নস্তুপ, পচাগলা লাশের আর পোড়ামাটির গন্ধ। যেদিন 'বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) তখনো আকাশ-বাতাসে বারুদ আর লাশের গন্ধ। দুঃখিনী মাটির গগনবিদারী কান্না ও ধ্বংসস্তুপের পৈশাচিকরূপ কালের স্বাক্ষী হয়ে অত্যাচারের বিভৎসতার জানান দেয়। বঙ্গবন্ধু কেঁদে ফেললেন সেদিন-'এ কী দেখছি'? নিজে সারা জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় জেলেন বদ্ধ চার দেয়ালের জীবন কাটিয়েছেন যাতে এ দেশের প্রিয় মানুষগুলো সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, হাসতে পারে, খোলা বাতাসে খেলতে পারে, পেট ভরে দু'বেলা খেতে পারে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন এ সব মানুষদের নিয়ে। আর ভাবতেন কবে এ দেশের মানুষগুলোকে মানুষরূপে গড়তে পারবেন। কিন্তু দেশের মাটিতে পা রেখে তিনি এ কী দেখছেন? অঝোর ধারায় কাঁদলেন আর আপন মনেই গেঁথে নিলেন নিজের ভাবনা আগামী দিনে কী করতে হবে তাঁকে। কীভাবে দেশকে গড়বেন।

আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশ পুর্ণগঠনে লেগে পড়েন সহযোগীদের নিয়ে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। সবই নুতনভাবে গড়ে তোলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধকালীন সময়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত অসংখ্য গ্রন্থাগারসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পরযদুস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেসব বিবেচনায় নিয়েই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিকল্পনা গৃহীত হয় দেশ পুনর্গঠনের জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

আলোকে বিশেষ করে ঔনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার সরকার এক দূরদর্শী ও সুদূর-প্রসারী মনোভাব নিয়ে ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনে যুগান্তকারী প্রতিবেদন পেশ করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর লালিত ভাবনার যুগান্তকারী প্রতিফলন ঘটে কমিশনের প্রতিবেদনে। যার বাস্তবায়নে অনায়াসে পিছিয়ে থাকা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই বিবেচনায় রেখে কমিশন সঠিক দায়িত্ব পালন করন যার বাস্তবতা আজো অনস্বীকার্য।

এতে এই উপলব্ধ হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যেকোন গবেষণা ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষা তথা প্রতিষ্ঠানগুলোর হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ। বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাঞ্জল ও স্বার্থক করে তুলতে হলে নতুনভাবে সাজাতে হবে। এ বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধু কুদরত-ই-খুদা' শিক্ষা কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রতিবেদনে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিধি বা মান নির্দেশ করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মী এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগুতে পারেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে কিছুটা সমতা বিধান হয়। নির্দেশিত মানের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনর্বিবেচনা আবশ্যক; এমন ধারণা থেকেই ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র প্রতিবেদনটি পূর্ণতা পায়। ঔপনিবেশিক ভাবধরায় লালিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলো আগামী প্রজন্মের কী কাজে আসবে ভেবে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার পূণর্গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় আনবে এটাই তো স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনটি ভেবেছেন তেমন দিকনির্দেশনার সম্পূরক হিসেবেই যুৎসই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বর্ণনা থেকে তাই প্রতিভাত হয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতিএমনটাই হওয়া উচিৎ যে কেউ তা স্বীকার করবেন। ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র কমিশনের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিবেচ্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। ২৪

১. প্রাথমিক স্কুলের গ্রন্থাগার

বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও মর্যাদাবোধ জাগানো এবং পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকদের, পরে প্রাথমিক স্কুলের উপর বর্তায়। কিন্তু দায়িত্বযথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। এ পর্যন্ত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ দেশের প্রাথমিক স্কুলে পরিবেশনের কথা চিন্তা করা হয়নি। ফলে প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন করে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্ধারিত প্রাথমিক স্কুলকে ভ্রাম্যমান বইয়ের শিবির রূপে ব্যবহার করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে শিশুদের জন্য মনোরম বই ও সাময়িকী প্রকাশনা ও তা স্বল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগার

মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেও গ্রন্থাগার অত্যন্ত অবহেলিত। বইয়ের স্বল্পতা, স্থানাভাব, গ্রন্থাগারিকের অভাব, সর্বোপরি শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে বই পড়ার

প্রেরণার অভাব মাধ্যমিক স্কুলগুলোর করুণ চিত্রের পরিচয় প্রদান করে। মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের সর্বত্র সুসমভাবে নির্ধারিত নিম্নতম মানের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতক গড়ে তোলার দিকে আশু দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ স্থাপন মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের ব্যর্থতায় সুনিশ্চিত পরিণাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতা।

৩. কলেজ গ্রন্থাগার

দেশের করেজের গ্রন্থাগারগুলোর দৈন্যতা মূলত মাধ্যমিক স্কুলোর মতোই। সরকারি কলেজগুলোর অবস্থা একটু ভালো হলেও বেসরকারি কলেজগুলোর গ্রন্থাগারের দুর্দশা অত্যন্ত প্রকট। সম্প্রতি অনেক কলেজ ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, কোন কোন কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে, এমন কি কিছু সংখ্যক কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশ প্রবর্তন করা হয়েছ। কিন্তু ঐসব কলেজগুলার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের বস্তুত কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। কলেজগুলোকে বড়, ছোট ও মাঝারি-এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত করে গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের নিম্নতম মান নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থাগারের আয়তন. ব্যয় বরাদ্দ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে, কমিশনের মতে তাও সন্তোষজনক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলোর কার্যাকারিতা ও দুর্বলতার

খতিয়ান তৈরি করা দরকার। এই খতিয়ানের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের জন্য প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন দরকার মনে করে কমিশন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই-সাময়িকীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, গবেষণা কর্মকে জোরদার করবার জন্য রেফারেন্স বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশি বেই, সাময়িকী, ফিল্ম, ইত্যাদী আমদানির জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারী আনুকুল্যের প্রয়োজন হবে।

৫. গণগ্রন্থাগার

উন্নত দেশে গণগ্রন্থাগার বলতে বোঝায় আইনভিত্তিক ট্যাক্স নির্ভর সাংস্কৃতিক সেবা প্রতিষ্ঠান, যাতে জনগণের প্রবেশাধিকার অবাধ, সর্বস্তরের জনগণ সেখানে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থী সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরাও গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগারের বিস্তার, যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার বাস্থানের অনধিক এক মাইলের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের সেবা পেতে পারেন। তজ্জন্য গণগ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে ট্রাক্স ধার্য, গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তর স্থাপন এবং গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

অবিলম্বে রাজশাহীতে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা দরকার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় অবস্থিত সরকারি গণগ্রন্থাগারের স্থানাভাব সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং এদের বই বরাদ্দ তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনাবর্তক মঞ্জুরীর ব্যবস্থা

করতে হবে। বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারকে জাথীয় গ্রন্থাগারে উন্নীত বরে একে কপিরাইটের অধিকার দিতে হবে এবং আইনভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে গঠন এবং গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

৬. জাতীয় আর্কাইভস

রাষ্ট্র ও নাগরিকদেরে অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড এবং জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণার প্রয়োজনে সুষ্ঠূ বিন্যাসের জন্য আর্কাইভস পরিদপ্তর স্থাপন করা ও জাতীয় আর্কাইভসকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান এবং জাতীয় আর্কাইভস কমিশন নিয়োগ করা দরকার।

৭. গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিচালনের কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণের পক্ষে বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ খোলা এবং ঢাকায় একপট গ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক বলে কমিশিন সুপারিশ করে। সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকেদেরকে পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ বলেও কমিশন সুপারিশ করে।

সুপারিশগুলো কমিশনের হলেও প্রকারন্তরে বঙ্গবন্ধুই মনেপ্রাণে চাইছিলেন এমন একটি সুগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হোক যাতে প্রজন্মান্তরের জন্য একটি সুশিক্ষিত

জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি মনেপ্রাণে এও বিশ্বাস করতেন যে, সুশিক্ষিত, মননশীল ও সৃষ্টিশীল জাতি গঠন করতে না পারলে এদেশ কখনো পৃথিবীর বুকে উন্নত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। তাই তিনি পুণর্গঠনের প্রথম পর্যায়েই ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। সবই নতুনভাবে গড়ে তোলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুণর্গঠন, এক কোটি মানুষের পুণর্বাসন, যোগাযোগ বচ্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুণর্গঠন, ১১,০০০ নতুন প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যালণের জন্য নারী পুণর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির খাজনা মওকুফসহ আরো অষংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি সুদৃঢ় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। যার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ করে ধীরে ধীরে দেশকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস তিনি চালিয়েছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দীজীবনের বিভিন্ন রকজমের কষ্ট ও অভাব বোধ থেকে বঙ্গবন্ধ বইপ্রেমী হয়ে ওঠেন। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে, এর মধ্যে কিছু সময় বাদে ১০ জানুযারি ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর একাকিত্ব জীবনে একমাত্র সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বইকে। নিঃসঙ্গ জীবনে বইকে যেভাবে আকড়ে থেকে বেঁচেছিলেন সেইভাবে তিনি তাঁর পরিবারকে পাননি। সংগত কারণেই বইয়ের প্রতি তাঁর একটা নিগূঢ় মায়া ও অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে ওঠে। কারাগারে অন্তরীণ জীবনে বইয়ের অভাব না খেয়ে থাকার চেয়েও বেশী পীড়ণ দিতো। নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতেন বইয়ের পাতায় চোখ রেখে। কারণ কারাগারে কারোর সঙ্গে কথার বলার সুযোগ ছিলো না

অথবা কথা বলতে দেওয়া হতো না। তাই তিনি বইকে একান্ত সঙ্গী করে সময় অতিবাঞ্চিত করতেন। বঙ্গবন্ধু রোজনামচায় ২০ জুলাই ১৯৬৬, বুধবার লিখেছেন, ''দিনভরই আমি বই নিয়ে পড়ে থাকি। কারণ সময় কাটাবার আমার আর তো কোনো উপায় নাই। কারো সাথে দু'এক মিনিট কথা বলব তা-ও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।''২৫ ১ মার্চ ১৯৬৭, বুধবার বঙ্গবন্ধু একই কথা আবার লিখেছেন, ''বইপড়া ছাড়া আর তো কোন উপায় নাই। খবরের কাগজ আর বই''। ২৬ বইপ্রেম থেকে গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসা জন্মানো, খুবই স্বাভাবিক। তিন বেলা খাওয়ার চেয়ে বই নিয়ে পড়ে থাকা ছিল তাঁর বেশি আনন্দ। যার সম্যক উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই ডক্টর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে। এর আগে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হয়ে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন গ্রন্থাগারের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভলোবাসারই নিরেট বহিঃপ্রকাশ।

এই আলোকেই বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যাবান উপাদানসমূহ সুষ্ঠূভাবে সংরক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ৬ নভেম্বর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, প্রথমে ভূতের গলি, হাতিরপুলের একটি ভাড়া বাড়িতে। এরই অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ পায় ১৯৭৫ সালে। প্রায় একযুগ পরে শের-ই-বাংলানগরের আগারগাঁওতে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস স্থানান্তরিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বংলা গড়ার অদম্য বাসনাকে সম্মান জানিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জনগণ আর্থ-সামাজিক তথা দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিবেদিত হলো এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জরে ভাঙ্গাচুরা, জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা লুণ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলোকে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে গণগ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ গৃহীত হয় বঙ্গবন্ধুর একান্ত নির্দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য। এতে প্রায়

২,৪০,৬৩,০০০.০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
২৭

বঙ্গবন্ধুর সরকার গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নসহ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোকে মান সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। কারণ সদ্য স্বাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে দ্রুততম সময়ে গড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা করার তাগাদা অনুভব করা হয়। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প-কারখানা, যাদুঘর প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে গড়ে তুলে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অনেক বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো গণগ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট ও উন্নতমানের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এগুলোই মূলত দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর এ বিশ্বাস ও ভাবনা থেওকই ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির আপন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় থানায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন ডক্টর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর মাযহারুল ইসলাম। স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুরবই পড়ার ক্ষুধা থেকে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার অদম্য তাগাদা অনুভব করেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসহ গণগ্রন্থাগারগুলোর পুণনির্মাণসহ নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের-বিশেষত পেশাজীবীদের, আর ভাগ্যবিড়ম্বিত এ জাতি। যে মহামানব আমাদের লালসবুজের একটি পতাকা দিলেন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য, যে মহাপুরুষ নিজের শোবার ঘর ছেড়ে গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠা করেন, যে মানুষ বই পড়ে পড়ে সোনার বংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, বইয়ের পংক্তির মতো সাজানো-গুছানো স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ভাবতেন-কী বিশাল সমুদ্রের মতো হৃদয়ের অধিকারী মানুষ না হলে কী বলতে পারতেন-''আমিতো একাকী আছি, বই আর কাগজ আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজেকে ডুবাইয়া রাখি'' (কারাগারের রোজনামচা)। এই অনন্য সাধারণ মানসের অধিকারী ব্যক্তি শেখ মুজিবকে কতিপয় পথভ্রষ্ট ঘাতক তাদের অব্যর্থ গুলি বিদীর্ণ করে একসঙ্গে বাঙালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম মহামানব বঙ্গবন্ধু ও তাঁর প্রিয় বইকে। আর আমরা হারাই একজন প্রকৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমীকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের অন্ধকার রাত্রিতে।

৫ . পঁচাত্তরোত্তর থেকে বর্তমান পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধুর ১৩১৩ দিনের শাসনামলে আর যাই হোক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে সুষ্ঠূভাবে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হয়। স্পষ্টত লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের গণগ্রন্থাগুলোর তেমন কোন উন্নতি প্রত্যক্ষা করা না গেলেও, বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো মোটামুটিভাবে উন্নতি লাভ করে। ২৮

এখানে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা-পূর্বকালে দেশের তিনটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও রাজশাহী বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ১৯৮৩ সালে। ২৯

এভাবে বহুদিন অতিবাহিত হয়। গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে পুরোপুরিস্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের বাংলাদেশটা কেবলমাত্র একটা গুটিপোকার রূপ পেয়েছিল; তিনি এটাকে প্রজাপতি হিসেবে ধেখতে

চেয়েছিলেন। সেই প্রজাপতি রঙ্গীন পাখা মেলে তাঁর সামনে উড়ে বেড়াবে; তিনি ওড়াওড়ির সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবেন। পরিপূর্ণতা পেতে কিছুটা সময়তো চাই? ধ্বংসস্তুপ থেকে খুঁজে পাওয়া গুটিপোকাটিকে একটা পরিবেশ দিতে হবে। তাই ভাবছিলেন কীভাবে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গুটিপোকাটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিরূপে রঙ্গীন পাখা মেলে আর উড়তে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বংলা আবার সুনশান শ্মশানে পরিণত হয় ঘাতকের অভিঘাতে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের পর পূর্বের গৃহীত সকল কার্যক্রমই অকার্যকর হয়ে যায়। অনেক কিছুর মতোই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাবাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। ৩০ সামরিক শাসনের যাতাকলে উন্নয়ন ও শিক্ষাকার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের ''প্রায় এক দশক পরে ১৯৮১ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বৃটিশ কাউন্সিলের যৌথ সহযোগিতায় বৃটিশ নাগরিক জে. এস পার্কার বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারের উপর একটি জরিপ কার্য সম্পাদন করেন। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রন্থাগার উন্নয়ন' শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বৃটিশ কাউন্সিল ও ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে। সেমিনারে জে. এস পার্কার কর্তৃক সম্পাদিত জরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়।"৩১ সেমিনারের পরপরই রসমিনারের উপর আলোচনা করে বক্ষমান প্রবন্ধকারের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত তৎকালীন 'বাংলার বাণী' পত্রিকায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সালে বর্তমান গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত দেশে সরকারি পর্যায়ে কেবল ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারেএবং অপর তিনটি বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার কাজ করছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০-৮১ সালে গৃহীত বাংলাদেশে 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীকে কেন্দ্রবিন্দু করে দেশে একটি গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তরের কাঠামো অনুমোদন করা হয়। ৩২ এদিকে ১৯৮২ সালে সরকার

কর্তৃক তৎকালীন ‘বাংলাদেশ পরিষদ’কে বিরুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং প্রশাসনিক পুণর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্র/গ্রন্থাগারসমূহকে নিয়ে দেশে একটি ‘গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর’ গঠনের পক্ষে সুপারিশ প্রদান করে। ৩৩ এ অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩৪ অন্যদিকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশিত গ্রন্থাগার নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী ‘‘বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ১০৬৫টি; এর মধ্যে ১১২টি গ্রন্থাগারের বয়স ৫০ বছরের অধিক’। . . . ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এখাতে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৩৫

এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি’ কর্তৃক ঢাকায়। সর্বোপরি গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ধারা অত্যন্ত মন্থর গতিতে প্রবাহমান হয়। এ সময়ে নতুন কোন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে বলে জানা যায়নি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ উপমহাদেশে ১৯১১ সালে বরোদার W.C. Borde ‘র তত্ত্বাধানে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯১৫ ও ১৯২৯ সালে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় এবং আমেরিকান গ্রন্থাগারিক Asa Don Dickenso‘র তত্ত্বাবধানে লাহোরে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ওখান থেকে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক বলে খ্যাত কোলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির মরহুম

গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ খানসহ বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এর দীর্ঘ সময় পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহী'র প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে প্রথম তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয় ঢাকা শ্বিবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কলা অনুষদের অধীনে। ৩৬ পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ফুলব্রাইট বৃত্তি কর্মসূচীতে 'গরংং গরষষবৎবফ খ গবঃযাধহ' উক্ত সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষাদান করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। ৩৭ এটি ছিল ছয় মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স। মোট চার কোর্স পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৯-১৯৬০ ও ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। ৩৮ ফুলব্রাইট বৃত্তি ভিত্তিক তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স বন্ধ হয়ে গেলে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে ১৯৫৮ সালে ৬ মাস মেয়াদী একটি সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করে। একই সময়ে ইউনিভির্সিটি অব লন্ডন'র আদলে ১৯৫৯-১৯৬০ শিক্ষাবর্ষে ১ বছর মেয়াদী স্নতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স অব আর্টস কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে ১৯৬২ সালে। ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাস্টার্স অব আর্টস কোর্স অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে শুরু হয়। ১৯৬৪-১৯৬৫ শিক্ষা বর্ষটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয় উন্নয়নের মডেল হিসেবে। এই শিক্ষা বর্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সটি স্বীকৃতি লাভ করে এবং 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' হিসেবে কলা অনুষদের অধীনে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে সংগঠিত হয়। ৩৯

১৯৭৪-৭৫ সালে দুই মেয়াদী 'মাস্টার্স অব ফিলোসফি' (এমফিল) প্রোগ্রামকে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ৪০ এবং ১৯৭৫-১৯৭৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে কোর্স চালু হয়। ৪১ উক্ত শিক্ষাবর্ষের শেষে 'মাস্টার্স অব আর্টস' শীর্ষক আরেকটি দুই বছর মেয়াদী কোর্সের অনুমোদন দেওয়া হয়; যার প্রথম বছর প্রিলিমিনারী এবং দ্বিতীয় বর্ষ 'মাস্টার্স অব আর্টসফাইনাল হিসেবে পরিগণিত হবে। ৪২ একই সময়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সটিও চলতে থাকলো সমান্তরালভাবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'ডক্টর অব ফিলোসফি' (পিএইচডি) প্রোগ্রামটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ১৯১৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে। ৪৩ এবং সে বছর থেকেই কার্যক্রম চালু হয়। এর ফলে বিভাগের কার্য পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে।

এই সময়ে ওপশাজীবী সংগঠন বেলিড বিভাগের নাম পরিবর্তন ও অনার্স কোর্স প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দেন-দরবার ও আবেদন-নিবেদন করেছে। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমলে নিয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদী গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ অনার্স) ডিগ্রী হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ৪৪ একই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ''গ্রন্থাগার ওতথ্যবিজ্ঞান বিভাগ'' রূপে নামকরণ করা হয়। অনার্স কোর্স প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সটি বিলুপ্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিকে অনুরোধ করে কোর্সটি তাদের দায়িত্বে পরিচালনা করার জন্য। ৪৫ ১৯৮৯ সালে কোর্সটি চালু করলেও অজ্ঞাত কারণে সমিতি কোর্সটি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। যা পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে, যদিও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিই উক্ত ইনস্টিটিউটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে একমাত্র অধিকারী।

১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষ থেকে চলমান ডিগ্রী (পাশ) ও স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজসমূহে। [৪৬] ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছরের স্নাতকোত্তর (এমএ) কোর্স চালু করে। [৪৭] এছাড়াও ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়কে পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তিন বছরের স্নাতক শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিবর্তন করে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় চার বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে [৪৮] এবং ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষা বর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) কোর্সের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) কে পেশাগত ডিগ্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর করা হয়। [৪৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামকরণ করে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিকায়নের একটি প্রশংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। [৫০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে। [৫১] গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ঘোষণা করে তিন বছর মেয়াদী গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান অনার্স কোর্স প্রবর্তন করে ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। অতঃপর এই বিভাগ থেকে এক বছর মেয়াদী সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা হয় [৫২] এবং ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ তিন বছর মেয়াদের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর অনার্স কোর্স চালু করা হয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে।

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী তথা বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (পাশ) কোর্সে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৪০০ নম্বরের অপশনাল বিষয় নেয়ার সুযোগ প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত তিনটি কলেজে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার সমিতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত না হলেও দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের দাবী-দাওয়া পূরণ ও উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (LAB) নাম উল্লেখযোগ্য। দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে বারগেইনিং প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ জন্য বরেণ্য কতিপয় ব্যক্তিত্ব ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরি পরিষদ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খান, মরহুম রাকিব হোসেন ও মরহুম আবদুর রহমান মৃধা । এছাড়াও আরো ১০ জন উক্ত কার্যকরি পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে আরো অনেকগুলো কার্যকরি পরিষদ গঠিত হয় এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বাহ্যত তেমন কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। পেশাগত ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত একটি শূন্যতা ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বিরাজ করছিল।

ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুল মান্নান'র নেতৃত্বে ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার'র সহযোগিতায় সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়াস সাফল্য লাভ করে। তারই ফলশ্রুতিতে ২০০৪ সালে সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রথম কার্যকরি পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার ও সৈয়দ আলী আকবর যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়। উক্ত পরিষদ ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে পেশাগত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে। সমিতি 'ইস্টার্ণ লাইব্রেরিয়ান' শীর্ষক একটি সাময়িকী ও ১৯৯০ সাল থেকে ড. মোঃ আবদুসসাত্তা'র সম্পাদনায় 'উপাত্ত' শিরোনামে একটি নিউজলেটার অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পায়। এছাড়া ৬মাস মেয়াদী একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ১৯৯৮-২০০০ সালে নির্বাচিত কার্যকরি পরিষদের সময়কালে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার'র সভাপতিত্বে ও সম্পাদনায় ল্যাব সদস্যদের একটি ডাইরেক্টরি প্রকাশিত হয়। ৫৩

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এমন একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন পেশাগত ও পেশাজীবীদের মানোন্নয়নের কোন প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়নি। পেশাজীবীদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল, তখনই একদল নবীন ও অপেক্ষাকৃত তরুন প্রজন্মের পেশাজীবী স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগঠিত হয়। এক ঊষালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটের উন্মুক্ত সবুজ প্রাঙ্গণে ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইয়ং লাইব্রেরিয়ানস্ ইনফরমেশন সাইন্টিস্টস্ এন্ড ডকুমেন্টালিস্টস্' (BAYLID) শিরোনামে একটি নিরঙ্কুশ পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৫৪ ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে শফিক মাহমুদ মান্নান দায়িত্ব পালন করেন (২৩.০১.১৯৮৬-২৫.৪.১৯৮৬)। তিন মাস পর ২৬.০৪.১৯৮৬ সালে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়; পরিষদের প্রথম চেয়াম্যান ও সেক্রেটারি

জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মুহম্মদ আবদুসসাত্তার ও মোঃ হারুন-অর-রশীদ। প্রথম গঠিত শিরোনামের 'ইয়ং' শব্দটি পরিবর্তন করে বেলিড'র বর্তমান শিরোনাম নির্ধারণ করে সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এর বাংলা শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি' ও ইংরেজি শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লাইব্রেরিয়ানস্ ইনফরমেশন সাইন্টিস্টস্ এন্ড ডকুমেন্টালিস্টস্' (BALID)। এখন পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার পেশার বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে চলেছে। বেলিড 'ইনফরমেটিকস্' শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এর একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে; ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ।

এছাড়াও আরো কিছু বিশেষায়িত পেশাজীবী সংগঠন স্ব স্ব অবস্থান থেকে পেশার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি

সাম্প্রতিক বিশ্বে তথ্য অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে গণ্য। আমরাও নিঃসন্দেহে তথ্যের মধ্যে বসবাস করছি। এখন অর্থকরী সম্পদ অপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ জাতিই সম্পদশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃত। যার যত তথ্য সেই তত সম্পদশালী। জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাত্র তিন দশক আগেও পরিস্থিতি ছিলো ভিন্ন। তথ্য বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় তথ্য-ব্যবহারকারীদের রীতিমতো দুর্ভাবনার কারণ ছিলো। কিন্তু সেই উৎকণ্ঠা এখন আর নেই। তথ্য-সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য বিস্ফেরণের ভযাবহতায় রূপান্তরিত হয়েছে 'তথ্য বিপ্লবে'। বস্তুত, তথ্য বিপ-বের ফলেই

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে অখন্ড বিশ্বপল্লীতে। তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়ায় বিশ্ব এখন নিরবচ্ছিন্ন তথ্যগ্রাম হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য সেবায় ব্যবহৃত কারিগরি জ্ঞান ও কলাকৌশল এখন তাই নতুন অভিধায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' হিসেবেই চিহ্নিত। ৫৫

'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই মানুষের মধ্যে বৈমশ্বক অনুভূতি দেশকাল-উর্দ্ধে সংহতিবোধ প্রসারিত ও জাগ্রত হয়েছে। দূরের সবকিছুকে অতি কাছের মনে হয়। প্রত্যহিক জীবন-যাপন ব্যবস্থা, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছে গুণগত পরিবর্তন। মাত্র নব্বিইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট এলগোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবৎ শিশুদেরে বিশ্বপল্লীর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ৫৬ এই উপলব্ধি একটু দেরিতে হলেও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে সমৃদ্ধতথ্য ব্যবস্থা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের অনবিচ্ছিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করতে আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না । এ ভিত্তিভূমি থেকেই কেবল দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৩১৩ দিনের শাসনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনা বংলা গড়বেন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে। সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালত বিশেষত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'ব্যবহার করে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য ববস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য ব্যবস্থাপনায় কমপিউটার ভিত্তিক অনলাইন ও অফলাইন প্রযুক্তি এ-ক্ষেত্রে

যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য বিস্ফোরণের ব্যাপক পরিমন্ডলকে ছোট করে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক অনলাইন তথ্যভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ সৃণষ্টর মাধ্যমে তথ্যের মহাসড়কে বিচরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ যুক্ত হয় তথ্যের মহাসড়কে তথ্য ইন্টারনেটের সঙ্গে। তখন থেকেই ডিজিটাল রেফারেন্স থেকে পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র দ্রুত এই সুযোগ নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খুব অল্প সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ডিজিটাল পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর আগে ঠিক ৮০'র দশকে ''তথ্যায়ন' একটি নতুন ধারণা"[৫৭] নিয়ে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশেষত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'তথ্যায়ন' সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংস্থাগুলো তথ্যায়ন সেবা দানের আওতায় বিবি-উগ্রাফিক্যাল সেবা যেমনুকারেন্ট অ্যাওয়ারনেস, কটেন্ট এনালাইসিস, এসডিআই, ডকুমেন্ট রিভিউ, ডকুমেন্ট রিপ্রোডাকশনসহ নানারকম তথ্যায়ন সেবায় নতুনত্ব আনয়ন করে।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানকে সহজ থেকে সহজতর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কল্যাণ সাধন করা। গণমানুষের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কোন ফলাফলই আশাব্যঞ্জক হয়না।[৫৮] . . . অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজনকে উপলব্ধির জন্য এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দরকার গণমানুষের উন্নতি সাধন। গণমানুষ তারাই যাদের বাস গ্রামীণ জনপদে। এদের বোধ বা সত্ত্বাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে তাদের

হাতে তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাই চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করে সোনার মানুষদের দিয়ে সোনার বাংলা গড়ার জন্য।

আধুনিক উন্নয়ন ভাবনায় 'উন্নয়নের জন্য তথ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উন্নয়ন ও তথ্য একটি অপরটির পরিপূরক। এই ভারনা থেকে উৎসারিত গ্রামীণ তথ্যব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয় ২০১০ সালে। আওয়ামীলীগ দ্বিতীয়বার সরকার রপরিচালনার সময়ে দেশজুড়ে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তথ্যব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী মোড় প্রবর্তন করে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সুফলকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ২০১০'র ১১ নভেম্বর সারা দেশে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র তথা ইউআিএসসি স্থাপনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। এ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৫৪৭টি ইউআইএসসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৫৯ অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচী কর্তৃক প্রকাশিত ইউআিএসসি নিউজলেটার থেকে জানা যায় প্রায় ৩২ লাখ মানুষ প্রতি মাসে ইউআইএসসি'র সেবা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৭৮ হাজার মানুষ (যার ৭০% নারী)। ইউআইএসসি থেকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, ৩০,২০০ মানুষ জীবন বীমা সেবা, ৩৫০০০ মানুষ (যার ৭০% নারী) টেলিমেডিসিন সেবা এবং ৪৫০০০ মানুষ কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করেন। ৬০

এভাবে সেবা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা চলমান থাকলে গণমানুষের উন্নয়নসাধনের প্রচেষ্টায় জাতীয়তাবোধ, ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রসার ঘটবে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, জীবন ও জীবিকাগত সাংস্কৃতিক ফলাফলকে সর্বজনীন করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে এ দেশের গণমানুষের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে গণগ্রন্থাগার সার্ভিসেরি একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। এই সার্ভিস থেকে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক সুষম

তথ্য সহজপ্রাপ্য করা সহজ হবে। যেহেতু ''উন্নয়নের প্রধান শর্ত গণশিক্ষা। লাইব্রেরি গণশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং দেশময় প্রসারিত ও সমন্বিত একটি গণগ্রন্থাগারপদ্ধতি স্থাপন অপরিহার্য।''৬১ তা হলেই গণশিক্ষার প্রসার ঘটবে। এ জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশ্বের স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ দেশগুলোতে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে নীতি অনুসৃ হয়ে থাকে, তা হচ্ছে সহযোগিতার নীতি। স্বচ্ছল দেশের জন্য যা প্রয়োজন, অস্বচ্ছল দেশের জন্য তা অপরিহার্য। প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সংগ্রহের নীতিঅনুসরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ফার্মিটন প্ল্যান' গ্রন্থাগার জগতে সুবিদিত। . . . সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আজকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য। ৬২ এর মধ্যে নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে দু'জন গবেষক ৬৩ উচ্চতর গবেষণায় সমন্বিত গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির যুৎসই ব্যবহার 'ক্রেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার' স্থাপন ও তথ্য ভাগাভাগি করে দেশের জনগোষ্ঠীর তথ্যের চাহিদা পূরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সুপারিশমালা আজকের প্রেক্ষাপটে বিবেচনার দাবী রাখে। অন্যদিকে নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি করে একে অপরের তথ্য সম্পদকে স্যায়ারিং-এর মাধ্যমে তথ্যসম্পদ পূর্ণ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সঠিক সময়ে জাতীয়ভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসোর্স স্যায়ারিং-এর বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচেনায় না নেয়ার ফলেই এখন পর্যন্ত 'কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার' গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা। যার আওতায় সরকারের উৎপাদিত তথ্য-উপত্তসহ দেশের সকল পেশার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকবে। নতুন প্রযুক্তির অংশ হিসেবে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, যুৎসই সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক

সময়ে সঠিক তথ্য যথার্থভাবে সহজলভ্য করার সুযোগ সৃষ্টি করা সময়োচিৎ সিদ্ধান্ত হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারলেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

সুপারিশ

১. দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা সুসংহতকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মিংটন প্ল্যানের আদলে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

২. ইউনেস্কো'র এসডিজি-২০৩০ বিশেষত শিক্ষা এজেন্ড-৪ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আদলে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা সর্বস্তরে সহজলভ্য করা।

৩. প্রতি থানায় একটি করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পোষণ করতেন।

৪. গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন যুগের দাবী।

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন এবং উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

৬. তথ্যসবা ব্যাহত না হয়-পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. পেশাজীবীদের সময়োপযোগীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।

৯. গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থায় ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণসহ প্রযক্তিগত সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১০. গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট সংযোজনের মাধ্যমে অবাধ ও রিবচ্ছিন্ন অনলাইন তথ্যব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১. তৃণমূল পর্যায়ে সময়োচিৎ তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় তথ্য হাব' বিনির্মাণ করা এখন সময়ের দাবী। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবী সমন্বয়ে জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

১২. গণগ্রন্থাগারের পরিসেবা কার্যক্রমকে গণমুখীন করার জন্য গণগ্রন্থাগারের আইন প্রবর্তন করা জরুরী।

১৩. বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারগুলোকে শীঘ্রই শিশুদের মননশীল, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশক প্রযক্তিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিদ্যাপিঠ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

১৪. রিবচ্ছিন্ন বিদ্যুত প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী।

১৫. চলমান গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা সংস্থাগুলোতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবী সমন্বয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিষ্ট লক্ষ্য সফল করা যেতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাস নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর নয়। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এদিক থেকে অনেক বেশি ঐতিহ্যের অধিকারী। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক ও জাতিগত বৈষম্যের জাতাকলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বার বার হোঁচট খেয়েছে। হিংস্র

নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সহস্র বছর ধরে। পাল, মোঘল, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ ও সবশেষে পাকিস্তানিদের নিষ্পেষণ ও শোষণ থেকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা মুক্তির স্বাদ পায়। বঙ্গবন্ধু জীবনের পাওয়া সময়টুকুর মধ্যে যে সময়টুকু জেগে থাকতেন তার পুরোটাই ছিল বাংলা, বাঙালী আর বই, বই, বই আর গ্রন্থাগার ভাবনার জন্য। পরাধীন সময়ের একশ বছর পর যখন সময় পেলেন, ১৯৫৮ সালে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন; স্থাপন করলেন এক গৌরবময় ইতিহাস। কোন বাঙালী ইতোপূর্বে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন, নজীর নেই। তিনি বাংলার সেই অবিসংবাদিত নেতা শত শত বছর পর শীর্ণ বৃক্ষতলে একটি চারা রোপণ করেছিলেন এক অতৃপ্ত আত্মার আকুতিতে যা মহীরূহ হয়ে আমাদের হৃদয়ে দোল খাচ্ছে। তিনি একজন বই, শুধু বই ও গ্রন্থাগার প্রেমী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি জীবনে এতো সময় ধরে বই পড়েছেন; নিজের পরিবারকেও এতো সময় দিতে পারেননি। তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য ছিলো একটি সোনার বাংলা গড়ার। একটি শিক্ষিত, মেধাবী, মননশীল, জ্ঞানী সৃষ্টিশীল এবং জ্ঞানদীপ্ত জাতি উপহার দেওয়া প্রত্যয়ী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এখানেই আমরা আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলাম বাঙালী জাতি হিসেবে। আমরা অভাগা জাতি ! অভিশপ্ত সময়ের একুশ বছর ধরে জাতির ভাগ্য বিরম্বিত হয় দুঃশাসনের অন্ধকারে।

টালিগঞ্জের 'অজানা বাতাস' শীর্ষক একটি চলচ্চিত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রীর দীপা'র এক প্রশ্নের উত্তরে মেঝো কাকামণি বলেন-''গাছেরা কথা বলে না, জমিয়ে রাখে'। ঠিক গাছেরা কি কথা বলে? শুধু জমিয়ে রাখে কোন প্রজন্মের জন্য। আরো এখন অনেক কিছু সৃষ্টি আছে যা সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, কথা, জ্ঞানকে জমিয়ে রাখে প্রজন্মকে আলোকতি করার জন্য। উত্তর প্রজন্মের প্রশ্নের অনুসন্ধিৎসুর জবাব মেলে ধরার জন্য। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি গাছ, পাথর ছাড়াও সেরা সৃষ্টি মানুষ; মানুষের চিন্তা-চেতনা, মনন চর্চা ও মেধার উৎসারিত জ্ঞানোসৃত অমর সৃষ্টিকে উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো-জিজ্ঞাসার পথ খোঁজার

জন্য মানুষই সৃষ্টি করে কোন এক বৃক্ষসমতলে একটি গ্রন্থাগার। 'অতীতের সকল মানুষের কথা গাছের কাছে রক্ষিত আছে'; মেয়েটি শুনে বলে-'তাহলে আমিও শুনবো।

সেই গাছ কি আমরা রোপণ করতে পেরেছি? যে গাছের তলায় বসে আমরা অতীত হওয়া মানুষের কথা শুনবো। সৃষ্টি-সভ্যতার অমরত্বের ধারক হিসেবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির সকল উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান উপাদান। না পারলেও, এখনই সময় বৃক্ষ রোপণের আগ্রহের মতো মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির মানসিকতা লালনের জন্য। বঙ্গবন্ধু সেই মানসিকতার বীজ-চারা রোপণ করে গিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে, ১৯৭১ সালে, ১৯৭২ সালে, ১৯৭৪ সালে সব শেষে নিজের ঘরে জীবনের বিদীর্ণ পরতে; যেনো রোপিত চাড়ায় গুটিপোকা রূপ নেয়, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মহামানবতাই প্রজাপতিরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। পরিপূর্ণতা পেতে কিছুটা সময়তো চাই? ধ্বংসস্তুপ থেকে খুঁজে পাওয়া গুটিপোকার বীজটিকে আসুন লালন-পালন করি। একটা পরিবেশ রচনা করে গুটিপোকাটিকে একটি প্রজাপতির রূপ দেই না কেন? জাতি রঙ্গীন প্রজাপতির রূপ-লাবণ্য উপভোগ করতে পারবে। আবার আমরা আশীর্বাদপুষ্ট হই। অভিশাপের গ্লানিমুক্ত হই।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৩৯০ বাং)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস।' কলিকাতা। কাফেলা; বাংলাদেশ সংখ্যা-১৩৯০ বাং আশ্বিন, ৩(৬), পৃঃ ৯৮।

২. Mishra, J (1979). History of libraries and librarianship in India since 1950. Delhi: Anna Ram.

৩. বাগল, যোগেস চন্দ্র (১৯৭১)। বঙ্গ সংস্কৃতির কথা। কলিকাতা। পৃঃ ২।

৪. পূর্বোক্ত।

৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ৫।

৬. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

৭. All India Conference of Librarians. Lahore: January 4-8, 1918. A proceedings. Simla, Govt Monotype Press, 1918, p.3-4. Quoted from Anowar, M.A. `Problems of public library development in Pakistan'. In: The Eastern Librarian, 5(1), Dhaka: September, 1970. p.8.

৮. Ahmed Hossain. `The need for public library legislation.' In: The need for public library development, ed. by M.S. Khan and T.J. Moughan. Dhaka, 1966. p.63.

৯. বসু, প্রমীল চন্দ্র (১৩৮২)। 'বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী।' গ্রন্থাগার, ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। কলিকাতা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পৃঃ ৩১।

১০. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

১১. বসু, প্রমীল চন্দ্র। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৩।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

১৪. পূর্বোক্ত।

১৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ১০০।

১৬. Khan, M. Siddiq (1967). `Libraries in Pakistan' in Journal of Library History, vol-II, p.60.

১৭. Moid, M (1958). `Library service in Pakistan' in Pakistan Library Review, vol-I, p.9.

১৮. Dhaka University. Annual Report, 1959-60. Dhaka University, 1960. p. 38.

১৯. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১।

২০. সারোয়ার হোসেন (১৩৯৬ বাং)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা'। গ্রন্থাগার, ৩৯(৬), পৃঃ ১৩৬।

২১. মান্নান, এস. এম. ও আবদুস সাত্তার, ম. (১৯৯৪)। 'বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগার: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৫৪-১৯৯২), নিবন্ধমালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র। অষ্টম খন্ড, জুন, পৃঃ ১৫৫।

২২. চৌধুরী, মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার ও জিল্লুর রহমান, মোঃ (২০০৯)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের বিকাশ', সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা। তথ্যাবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ৩৫।

২৩. পূর্বোক্ত।

২৪. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০০।

২৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)। গ্রন্থাগার: সারাংশ। ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পৃঃ ২৪৫-৭।

২৬. শেখ মুজিবুর রহমান। কারাগারের রোজনামচা। ঢাকা: পৃঃ ১৭২।

২৭. পূর্বোক্ত। পৃঃ ২০৮।

২৮. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১।

২৯. মাননান, এস. এম. ও আবদুস সাত্তার, ম. (১৯৯৪)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৫৫।

৩০. পূর্বোক্ত।

৩১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১-২।

৩২. পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০২।

৩৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। গণর্গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নথিপত্র থেকে সংকলিত।

৩৪. পূর্বোক্ত।

৩৫. খালিদ, কে. এম (২০২০)। স্মরণিকা; জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২০। ঢাকা: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। পৃঃ ১১।

৩৬. কাজী আবদুল মাজেদ (২০১৬)। 'জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা।' ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। বই ;৪৫(১১): পৃঃ৪৭।

৩৭. Khorasani, SSMA (1986).Gensis of library education in Bangladesh.The Eastern Librarian; 12 (1):55-60

৩৮. সারোয়ার হোসেন (১৩৯৬ বাং) 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা'। কোলকাতা: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। গ্রন্থাগার; ৩৯(৬): পৃঃ ১৩৬।

৩৯. Dhaka University (1960). Annual Report,1959-60; p.38

৪০. Dhaka University (1965). Annual Report,1964-65.

৪১. Dhaka University (1974). Syndicate Minutes, dated 23 February 1974 (Unpublished).

৪২. Dhaka University (1976). Annual Report,1975-76.

৪৩. Dhaka University (1977). Syndicate Minutes, 1977 (Unpublished).

৪৪. Dhaka University (1978). Syndicate Minutes, dated 6 May 1978 (Unpublished).

৪৫. Dhaka University (1988). Annual Report,1987-88.

৪৬. Khan, M. Shamsul Islam (1992). Preparing Bangladesh libraries and librarians for the 21st century: the case of library education. The Eastern Librarian, 17(1-2):49-58.

৪৭. Dhaka University (1990). Syndicate Minutes, dated 29 December 1990 (Unpublished).

৪৮. Dhaka University (1995). Annual Report,1994-95.

৪৯. Dhaka University (2000). Annual Report,1999-2000.

৫০. Dhaka University (2001). Syndicate Minutes, dated 6 December 2001 (Unpublished).

৫১. Rajshahi University (1992). Annual Report: 1991-1992.

৫২. Rajshahi University (1993). Annual Report: 1992-1993.

৫৩. Rajshahi University (1996). Annual Report: 1995-1996.

৫৪. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (২০০৫)। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। স্মরণিকা: ৮ম সাধারণ সভা ও জাতীয় সেমিনার ২০০৫। ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, পৃঃ ২৯।

৫৫. বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) কর্তক প্রকাশিত 'প্রচার পুস্তিকা', ১৯৯১ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২।

৫৬. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (২০০৫)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩০।

৫৭. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮১)। তথ্যায়ন: একটি নতুন ধারণা। মাসিক বই; ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

৫৮. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮৯)। বাং লাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং গ্রন্থাগার সেবাক্রমের রূপরেখা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা; ৩৪(জুন); ১৪০।

৫৯. মান্নান, এস.এম ও কাজী মোস্তাক গাউসুল হক (২০১৪)। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও তথ্য নেটওয়ার্ক: একটি প্রস্তাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা; ৩৪(জুন): ৮৪।

৬০. Access to Information (2014). Union Information and Service Centre: connecting the bottom millions. Dhaka: Access to Information (January 2014).

৬১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮২)। 'গ্রন্থাগার উন্নয়ন শীর্ষক জাতীয় সেমিনার'; বাংলার বাণী: ১ মার্চ।

৬২. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮৯)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৪৫।

৬৩. দু'জন গবেষক হলেন-প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুস সাত্তার ও প্রফেসর ড. এস. এম. মাননান যথাক্রমে তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু: ''দ্যা প্রোবলেমস এন্ড প্রোসপেক্টস অব নিউ টেকনোলজিস্ ইন লাইব্রেরিজ এন্ড ইনফরমেশন

সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ" এবং রিসোর্স স্যায়ারিং এন্ড নেটওয়ার্কিং এমং দ্যা লাইব্রেরিজ অব বাংলাদেশঃ প্রোবলেমস এন্ড প্রোসপেক্ট'।